# জাতিভেদ।



শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,
মহাশয়ের বক্তৃতা।



সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তক প্রচার বিভাগ
কমিটি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১ সাল।

# জাতিভেদ।



কিরূপে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল? ইহার প্রমাণ সকল আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব? যাহাকে বিশ্বাস-যোগ্য ইতিহাস বলে, যাহাতে অতীতকালের ইতিবৃত্ত যথা-যথরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাতে এরূপ গ্রন্থ বিরল; যে কিছু ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ আছে, তাহাও কবির কল্পনা দূষিত; সে সকলকে অতীতের ইতিবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করা দুষ্কর। এরূপ স্থলে উপায় কি? আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে একটী জাতির সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি যদি পাওয়া যায় এবং ঐ সকল গ্রন্থের কাল নির্ণয় যদি কোন প্রকারে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমরা বহুল পরিমাণে উক্ত জাতির সামাজিক ইতিবৃত্ত নির্ণয় করিতে পারি। মনে করুন বেদের কোন স্থানে যদি এরূপ একটী স্তুতি দেখি—হে ইন্দ্র! তুমি ত্বরায় তোমার উপাসকগণের নিকট এস, বণিক সমুদ্রে পোত প্রেরণ করিয়া যেরূপ উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করে, আমরাও সেইরূপ তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছি। এতদ্দ্বারা কি এরূপ

অনুমান করা যায় না যে, যে সময়ে বেদের উক্ত সূক্তটী রচিত হইয়াছিল সে সময়ে নিশ্চয় বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন হইত? এইরূপে জাতিভেদ প্রথার আদি নির্ণয়ের জন্যও আমাদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র সকল অবলম্বন করিয়া ইতিবৃত্তের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে।

এক্ষণে সকল গ্রন্থের মধ্যে আদি গ্রন্থ বেদ। তাহার মধ্যে আদিতম ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই ঋগ্বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। এই মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ গীতের ন্যায়। এই সকল মন্ত্র এককালের রচিত মন্ত্র নয়। তাহাদের ভাষা, বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণিত সমাজের ছবি প্রভৃতি দেখিলেই তাহাদিগকে নানা যুগের রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই এবং লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল না। তখন ঐ সকল মন্ত্র মখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত, এবং মুখে মুখে বিচরণ করিত। লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্রগুলি সর্ব্বদা শুনিত কিন্তু কেহ কখনও তাহা লিখিত দেখে নাই। এই জন্য ঐ সকলের নাম শ্রুতি হইয়াছিল। তৎপরে বর্ণমালার সৃষ্টির পরে সময়ে সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি হইতে ও লোক মুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া বর্ণিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগকে মণ্ডল, অধ্যায়, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভাগ

করিয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত বেদব্যাস নামে উক্ত হইয়াছেন। এই সকল ঋগ্বেদের কোন একটী সূক্ত পাঠ করিতে গেলেই দেখিতে পাইবেন যে সর্ব্বাগ্রেই অমুক দেবতা, অমুক ঋষি, অমুক ছন্দ, প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই সংগ্রহ-কর্ত্তা সংগ্রহ করিবার সময় যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া শুনিয়াছেন সেই মন্ত্রের অগ্রে সেই নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন, পথভিখারীদিগের মুখে আমরা প্রতিদিন কত শত সঙ্গীত শুনিয়া থাকি। তাহার কোনটী রামপ্রসাদের, কোনটী দেওয়ানজীর, কোনটী শ্রীধরের কোনটী অন্য অন্য কবির। আমরা অনেক দিন হইতে এই সকল গান শুনিয়া আসিতেছি, এবং অনেকগুলি কণ্ঠস্থও করিয়াছি কিন্তু কখনও পুস্তকাকারে লিখিত দেখি নাই। এখন যদি কেহ এইগুলি সংগ্রহ করিবার সংকল্প করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি করিতে হয়? তাঁহাকে এ ভিক্ষুকের নিকট দশটী, উহার নিকট চারিটী এইরূপ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়; অথচ সংগ্রহ করিবার সময় বিদ্যাপতির সময় অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত গান সকল একত্র নিবদ্ধ করিতে হয় এবং ভিক্ষুকদিগের মুখে যে গানের যে রচয়িতার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা লিখিয়া দিতে হয়। বেদ মন্ত্র সকল ঠিক এই প্রণালীতে সংগৃহীত ও বিভক্ত হইয়া-

ছিল। যাহা হউক বেদ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে আপনারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে বেদের মন্ত্র সকল এক সময়ে রচিত নহে, কোনটী বা অপরটীর সহস্র বৎসর পরে রচিত।

এই সকল বেদমন্ত্রে আমরা আদিম ভারত সমাজের অনেক কথা জানিতে পারি এবং এই সকল মন্ত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াই পণ্ডিতগণ আদিম সমাজের অনেক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি বেদোক্ত আর্য্যগণ (১) সুবিশাল নগর সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; (২) স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেন; (৩) যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ রক্ষার জন্য লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিতেন; (৪) শর তুণীর প্রভৃতি সাংগ্রামিক প্রহরণ সকল প্রস্তুত করিতেন; (৫) বাদ্যযন্ত্র সকল নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিতেন; (৬) যান বাহন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন; (৭) ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিবারণ করিতেন; (৮) সূক্ষ্ম গণনানুসারে সময় নির্দ্ধারণ করিতেন; (৯) এবং পথিকজনের সুবিধার নিমিত্ত পান্থশালা সকল নির্ম্মাণ করিতেন। এই সকল মন্ত্রে আরও জানিতে পারা যায় যে তাঁহাদের সমাজে (১০) কন্যাগণ পিতৃদায়ের অধিকারিণী হইতেন এবং (১১) নারীগণ অবরোধে না থাকিয়া প্রকাশ্য স্থানে গতায়াত করিতেন। এমন কি সভ্য সমাজের যে সকল গুরুতর পাপ তাহারও

নিদর্শন সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বারাঙ্গনাদিগের ছুক্রিয়ার এবং জারজ সন্তানদিগের গোপনে প্রসূত হওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখন আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন যে যে ঋগ্বেদে প্রাচীন সমাজের এত কথা উক্ত হইয়াছে তাহাতে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না? ইহার উত্তর এই, একটী স্থল ব্যতীত ঋগ্বেদের কুত্রাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম পুরুষ সূক্ত। এই সূক্তটিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে দেবগণ এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিলেন। সেই পুরুষের দেহ হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইল। নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন ঃ—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়।* * * * "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"

অর্থ,—সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহণ করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব সকল ও দুই

পাটী দন্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী এবং গো মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। * * * *

* * * ইহাঁর মুখই ব্রাহ্মণ হইল; বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিণত হইল; বৈশ্য যাহা দেখিতেছ, ইহাই তাঁহার উরূ এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।"

ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত সূক্তটীর ভাষা দেখিয়াই সামান্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিতেছেন, যে ইহা আধুনিক সংস্কৃত। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রের ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে। টীকাকারদিগের বিশেষ সাহায্য লইয়াও তাহার অর্থ বোধ অনেক সময় দুষ্কর। তাহার ব্যাকরণ বিভিন্ন, তাহার ছন্দ বিভিন্ন এবং তাহার অধিকাংশ শব্দ বর্ত্তমান সময়ে অপ্রচলিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটী পাঠ করুন।

"অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং।"

আধুনিক সংস্কৃত যাঁহারা জানেন তাঁহারা টীকাকারের সাহায্য ব্যতীত সহজে এই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রের ভাষা এইরূপ দুর্বোধ। কিন্তু পুরুষ সূক্ত হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহা কেমন সুবোধ আধুনিক সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী। ইহা দেখিয়াই একজন অনুমান করিতে পারেন যে এই অংশটুকু অপরাপর মন্ত্রের অনেক পরে রচিত হইয়া থাকিবে। মোক্ষ-

মূলার প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা ঋগ্বেদ মুদ্রিত করিয়াছেন এবং সকল বেদাঙ্গের আলোচনাতে নিরন্তর রত আছেন, তাঁহারাও প্রমাণ করিয়াছেন যে এই অংশটুকু অনেক পরে ঋগ্বেদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যেই আরও একটী আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন। এই সূক্ত মধ্যেই উক্ত হইয়াছে, যে ঐ দেব যজ্ঞ হইতে ঋগ্বেদ ও সামবেদ প্রসূত হইল। এতদ্দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না যে, এই মন্ত্র যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বেদ বিভাগ করার পরে অর্থাৎ বেদমন্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া ঋক, সাম, যজুঃ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পরে এই অংশটুকু রচনা ও প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। অথচ ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে মন্বত্রি প্রভৃতি স্মৃতি কর্ত্তাদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এবং মহাভারতাদি বর্ত্তমান আকারে লিখিত হইবার পূর্ব্বে এই সূক্ত রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ মন্বাদি গ্রন্থে ও মহাভারতাদিতে এই সূক্তের উল্লেখ ও জাতি সৃষ্টির এই বিবরণের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়।

হারীত স্মৃতিতে এক স্থানে আছে—

"বিধিনা পুরুষ সূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।"

অর্থাৎ পুরুষ সূক্তোক্ত বিধি দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে। মনু জাতিভেদের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন ঃ—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

ঈশ্বর লোকের বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ বাহু উরু ও পদদ্বয় হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে প্রকাশ করিলেন।

মহাভারতেও এই জাতি সৃষ্টির বিবরণের প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা;—

পুরূরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ। কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠ স্তন্মে ব্যাখ্যাত মর্হসি। মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম। বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এবচ। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়ানাং ভরতর্ষভ, বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

ইহার অর্থ;—পুরূরবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, এবং অপর তিন বর্ণই বা কিরূপে সৃষ্ট হইল? আর কেনই বা ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। মাতরিশ্বা বলিলেন। হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছেন এবং উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছেন; এবং হে ভরতর্ষভ পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণের পরিচর্য্যার্থ চতুর্থ বর্ণ শূদ্র পদদ্বয় হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে।" এই সমুদয় বচন পূর্ব্বোক্ত পুরুষ সূক্তের বর্ণানুসারে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পুরুষ

সূক্তের উক্ত অংশটুকু ঋগ্বেদের অপর সকল মন্ত্রাপেক্ষা আধুনিক। এখন আমরা সহজেই এই বিচার করিতে পারি যে জাতিভেদ যদি নিতান্ত আদিম কালেও থাকিত, যদি ইহা প্রাচীনতম আর্য্য সমাজের একটী বিশেষ প্রথা হইত, তাহা হইলে প্রাচীন মন্ত্র সকলের মধ্যে নিশ্চয়ই ইহার কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত। ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে, যে মন্ত্র সকলের মধ্যে প্রাচীনতম আর্য্যসমাজের এত প্রকার রীতি নীতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কিরূপে ঋত্বিকগণ যজ্ঞাদি করিতেন, কিরূপে জ্যোতির্ব্বিদ-গণ নক্ষত্রাদি লক্ষ্য করিতেন, কিরূপে সময় জানিতেন, কিরূপে কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিত; কিরূপে কুলস্ত্রীগণ যব ধানাদি পেষণ করিতেন, কিরূপে বণিকগণ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইত, সমাজের সকল আভ্যন্তরীণ কথাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ইহা কি সম্ভব যে সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার ন্যায় একটী প্রধান সামাজিক রীতির কোন আভাস থাকিবে না? এই জন্যই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা ভারতক্ষেত্রে আর্য্যগণের পদার্পণের পরে বহুকালে ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আর অতি প্রাচীনতম কালে যে বর্ণভেদ ছিল না, এরূপ সংস্কারের প্রমাণও শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে আছে;—

"ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতং।"

অর্থঃ—বর্ণভেদ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথা কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ অভ্যুদিত হইয়াছে। সমগ্র ঋগ্‌বেদ খানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্ বেদের প্রাচীনমন্ত্র সকল পাঠ করিলেই সর্ব্বত্র "আর্য্য" এবং "দস্যু" এইদুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র-কর্ত্তা ঋষিরা আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন "হে ইন্দ্র! তোমার শুভ্রবর্ণ বন্ধুদিগের সহায় হও, এবং কৃষ্ণ বর্ণ ত্বক্‌কে নিঃশেষ কর।" ইন্দ্রের প্রশংসার্থ তাঁহাকে "সুশিপ্র" শোভন-নাসিকাযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। এবং দস্যু বলিয়া যাহাদিগকে বর্ণন করা হইতেছে, তাহাদিগের প্রতি "নাসিকা বিহীন" ছাগের ন্যায় নাসিকা-বিশিষ্ট, আম মাংসাশী প্রভৃতি ঘৃণা সূচক শব্দ সকল প্রয়োগ করা হইতেছে। এই উক্তি পরম্পরাকে একত্র সমাবেশ করিয়া দেখিলে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, যে সময়ে এই সকল বেদ মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভারতসমাজে দুই শ্রেণীর মানব বিদ্যমান ছিল, এক শ্রেণীর লোক গৌর বর্ণ শোভন নাসিকাযুক্ত

ও পক্ক মাংসাশী, অপর শ্রেণী কৃষ্ণ বর্ণ, ছাগনাশা বিশিষ্ট ও আম মাংসাশী। প্রথম শ্রেণীর লোকগণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং অপর শ্রেণীকে দস্যু বা দাস বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। এবং ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ চলিত; কারণ তাহা যদি না হইবে তবে দস্যুদিগের উচ্ছেদের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট স্তুতি করিবার অভিপ্রায় কি? কেবল তাহা নহে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র মধ্যে এরূপ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এই দাস বা দস্যুদিগের কিয়দংশ পর্ব্বত পৃষ্ঠে বা বনাভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়া বাস করিত। এক স্থানে মন্ত্রকর্ত্তা বলিতেছেন "উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদবি" দাসকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দেও। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে দাসদিগের কেহ কেহ পর্ব্বতাদিতে অবস্থিতি করিত।

তবে আপনারা এখন মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করুন। এই দেখুন প্রাচীন ভারত সমাজে দুই দল লোকের সংগ্রাম। ইহাঁরা কখনই এক জাতীয় লোক নহেন, কারণ তাহাদের বর্ণ ও আকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। আপনারা এক্ষণে প্রশ্ন করিতে পারেন ইহারা তবে কে? বহুতর গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, এই গৌরবর্ণ জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্য আসিয়ার কোন হিমপ্রধান বিভাগে বাস করিতেন এবং মানব ইতিবৃত্তের কোন

অনির্দ্দিষ্ট কালে, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে আপনাদের আবাস ভূমি পরিহার করিয়া ভারতের সুবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি দেশে সপ্ত নদীর উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য্য সমাগম কালের ঘটনা সকল মানবস্মৃতির পূর্ব্বতন অজ্ঞানান্ধকার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্র সকলে এখানে তাহার সেখানে আভাস মাত্র জানিতে পারা যাইতেছে। তবে যেমন বর্ত্তমান জনসমাজ সকল পরিদর্শন করিয়া প্রাচীন সমাজ সকলের বিকাশ প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ আধুনিক জাতিদিগের ইতিহাস দেখিয়া প্রাচীন জাতি সকলের ইতিহাস নিরূপণ করিতে হয়। আমরা আবার জগতের অপরাপর জাতির ইতিবৃত্তে যখন দেখি যে এক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত সভ্য লোক আসিয়া কোন এক অসভ্যতর লোকের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে তখন আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে নবাগত শত্রুগণ আসিবামাত্র আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং সেই সংগ্রামে পরাস্ত হইলে আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কিয়দংশ জেতাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয় এবং অপরাংশ যাহারা আপনাদের স্বাধীনতাকে শান্তি অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করে, যাহারা সর্ব্বস্বাপহারী প্রবল শত্রুর দাসত্ব নিগড় কণ্ঠে ধারণ করা অপেক্ষা গিরি পৃষ্ঠে বা নির্জ্জন বনে

গিয়া মৃগয়াজীবী হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা গিরিশৃঙ্গ বা বিজন অরণ্যের ন্যায় দুরারোহ ও দুরাক্রম্য স্থান সকলে আশ্রয় লইয়া আপনাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। স্যাক্সনগণ যখন ইংলণ্ডে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন তখন কি ঘটনা ঘটিল? তখন ব্রিটনের আদিম অধিবাসিগণের সহিত তাঁহাদিগের যে বিরোধ ঘটনা হইয়াছিল তাহা সকলেই বিদিত আছেন। সেই সময়ে পরাভূত হইয়া আদিম অধিবাসিদিগের কিয়দংশ জেতাদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল গলে ধারণ করিতে এবং সামান্য ক্রীতদাসের ন্যায় জেতাদিগের গৃহে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে স্বীকৃত হইল; অবশিষ্টাংশ ওয়েল্‌স প্রদেশীয় ও স্কটলণ্ড প্রদেশীয় দূরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রাচীন গ্রীস দেশেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখ দেখিতে পাইবে যে, যখন লেসিডিমোনিয়াগণ সদলে স্পার্টা প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখনি আদিম অধিবাসিগণের কিয়দংশ দাসত্ব স্বীকার করিয়া হেলট বা দাসরূপে পরিণত হইল, অবশিষ্টাংশ মেসিনা প্রদেশের পর্ব্বত ও বন শ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সভ্যতম আমেরিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; যেখানে তিন চারিশত বৎসরের অধিক হইবে না, শ্বেতকায় ইউরোপীয় দল উপনিবেশ

সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে আদিম অধিবাসিদিগের কি দশা হইয়াছে! তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক শান্তিপ্রিয় তাহারা জেতৃগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জেতাদিগের গ্রাম ও জনপদ প্রভৃতিতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে; আর যাহারা স্বাধীনতাকে প্রিয়জ্ঞান করিয়াছে তাহারা জন-সঞ্চার-রহিত বিজন অরণ্যে বা দুর্লঙ্ঘ্য আণ্ডিসগিরির নিভৃত উপ-ত্যকা ও অধিত্যকাতে আশ্রয় লইয়া আছে। ভারতবর্ষেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যখন আর্য্যেরা সপ্তনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন এদেশের আদিম অধি-বাসিগণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন। এই জয়লাভের পর তাঁহাদের প্রভুত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। আদিম অধিবাসীগণের কিয়দংশ তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিল অপরাংশ পর্ব্বত ও অরণ্যাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাহাঁদের উপরে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা দাসত্ব স্বীকার করিল তাহারা দাস, ও যাহারা উপদ্রব-কারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা “দস্যু” নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়ে এক জাতির লোক। ইহারাই ভবিষ্যতের শূদ্র।

আপনারা দেখিলেন কিরূপে শূদ্র জাতির সৃষ্টি হইল। প্রাচীনকালে সকল দেশেই এই প্রথা ছিল যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইত, কিংবা যাহারা রণে পরাজিত হইয়া জেতাদিগের শরণাপন্ন হইত, তাহারা ক্রীতদাস বলিয়া

পরিগণিত হইত। তাহার পর তাহাদিগকে পশু-প্রায় ব্যবহার করিতে কাহারও মনে বাঁধিত না; শৃগালের ন্যায় তাহাদিগকে দান বিক্রয়ের অধিকার প্রভুর থাকিত; তাহাদের প্রাণের উপর কাহারও মায়া মমতা থাকিত না। বিশেষ বন্দীকৃত দাসগণ সভ্যতাংশে হীন হইলে ত কথাই ছিল না। তাহাদের প্রভুগণ তাহাদিগকে ঠিক পশুর প্রায় ব্যবহার করিত। এইরূপে প্রাচীন রোমনগরে বর্ষে বর্ষে অসভ্য জাতীয় যে সকল পুরুষ ও রমণী বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইত, রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বাজারে ক্রয় করিতেন এবং নিজ নিজ গৃহে অতি নীচ কায়িকশ্রমে ও পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও সহরের লোককে কৌতুক দেখাইবার জন্য এই সকল হতভাগ্য দাসদিগকে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহারা সেই ভয়ানক সমরে রক্তাক্ত হইয়া যখন নিহত হইত, তখন সমাগত নগরবাসিগণ চারিদিক হইতে করতালি দিয়া আনন্দধ্বনি করিত। পরাজিত ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রাচীন কালে এই ব্যবহার ছিল।

ভারতবর্ষে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আদিম অধিবাসিদিগের মধ্যে যাহারা আর্য্য জেতাগণের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা ত্বরায় সকল প্রকার সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রীতদাসের অবস্থাতে পরিণত

হইল। আর তাহাদেরই স্বজাতীয়গণ যাহারা পর্ব্বত প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা বিধিমতে আত-তায়ী আর্য্যগণের উপরে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ইতিহাসে নূতন কথা নয়। আমেরিকার ঔপনি-বেশিকদিগের উপর আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের উপদ্রবের কথা একবার স্মরণ করুন।

এখন একবার কল্পনাতে তৎকালীন আর্য্য সমাজের অবস্থা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করুন। একদিকে দেখুন একদল দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা-বিশিষ্ট বিদেশী-লোক আসিয়া পঞ্চনদের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক বাহুবলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করিয়া আপনাদের গ্রাম জনপদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন; কৃষি বাণিজ্যের আয়ো-জন করিতেছেন; অরণ্য সকল নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র সকল বিস্তার করিতেছেন; উপনিবেশের প্রান্ত-বর্ত্তী অরণ্যভূমি সকলে মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতেছেন; এবং আপনাদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে হোম কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আর একদিকে দেখুন পরাজিত আদিম অধিবাসিগণ পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপর উপদ্রব করিতেছে। আর্য্যেরা যাহাতে বিরক্ত হইতেন এই সকল অসভ্য দস্যুগণ তাহাই করি-তেছে। আর্য্যেরা ইহাদিগকে আম মাংসভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন সুতরাং ইহারা দুষ্টামি করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ-

ভূমিতে আম মাংস প্রভৃতি বর্ষণ করিতেছে; হঠাৎ বনাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাদের রমণীদিগকে পথে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা প্রাচীন যে সকল পৌরাণিক কথাতে ঋষিদিগের উপর রাক্ষসদিগের উপদ্রবের বিবরণ শুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, যখন প্রতিনিয়ত দস্যুগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল এবং তাহাদের ভয়ে সুখ শান্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা আর্য্যদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তখন আর্য্যগণের আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে কতকগুলি সবলকায় সাহসী ও সমর-কুশল লোক বাছিয়া আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইহাঁরা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁরাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ক্ষত্র শব্দের অর্থ যাহারা ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনার চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্র প্রভৃতি প্রভেদ ছিল না; কর্ম্মভেদ বশতঃ এই সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে একমাত্র জাতি ছিল তাহা হইতে ক্ষত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল ইহার একটী প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া হইয়াছে।

আর একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বৃহদারণক্য উপ-নিষদে আছে—

"ব্রহ্মবা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।"

অর্থ—অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না—সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।" যাঁহারা বেদ বা স্মৃতি কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন তাহারা জানেন যে ব্রহ্ম শব্দ ব্রাহ্মণ অর্থে ভূরি ভূরি স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে; এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। উপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এতদ্দেশে ইহা বেদ বলিয়া আদৃত সুতরাং দেখুন আমি জাতিভেদের উৎপত্তির যে বিবরণ দিতেছি তাহার প্রমাণ বেদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেখুন তবে কেমন করিয়া প্রাচীন আর্য্য-সমাজে শূদ্র ও ক্ষত্র দুইটী জাতির সূত্রপাত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবশিষ্ট আর্য্যগণ কি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোককে একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। সে কার্য্যটী কি? আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, যে সময়ে বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই; সুতরাং সে সময়ে ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইত। আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহার পূর্ব্বাবধিই তাঁহাদের

মধ্যে সোম যজ্ঞ ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এই গুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা প্রভূত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান হিন্দুগণের ও বর্ত্তমান পারসীক-দিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে একত্র বাস করিতেন। সুতরাং অগ্নির উপাসনাদি সেই সময়কার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে। যাহা হউক অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অগ্নির উপাসনাদি ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয়। আর্য্যেরা যখন অত্যুন্নত গিরিমণ্ডিত, বহুনদ পরিধৌত, ও শস্যশালী-শ্যামল-ক্ষেত্র-পূর্ণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন এখনকার প্রকৃতির গম্ভীর ও মনোরম ভাবসকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্তে কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা ঊষাকালে নবোদিত সূর্য্যের তরল কিরণচ্ছটা দ্বারা অনুরঞ্জিত নীলাকাশ দেখিতে লাগি-লেন, যখন নিদাঘের প্রখর তাপের পর প্রাবৃটকালের নব মেঘমালার ঘন নীলিমা প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ বন্যা সমূহের কল্লোলিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় সাগরে অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল এবং মন্ত্রের পর মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদ এই সকল কবিত্ব রসপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমষ্টি মাত্র। ইহার স্থানে স্থানে কবিত্ব কি সুন্দর! কি আশ্চর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের শক্তি! কি

হৃদয় মুগ্ধকর মানব প্রাণের স্বাভাবিক ছবি! বেদ মন্ত্রকার কবিগণ বর্ষাকালের ভেকের ক্রো কা ধ্বনির মধ্যেও এক প্রকার অপূর্ব্ব মাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল বেদমন্ত্রকে কবির কবিত্ব বল, বিহঙ্গমের স্বাধীন কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনি বল, সৌন্দর্য্য মোহিত-মানব-হৃদয়ের উচ্ছলিত ভাব-রাশি বল, ঠিক বলা হইল, কিন্তু শাস্ত্র বল, ধর্ম্মোপদেশ বল, লৌকিক কি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা বল ঠিক বলা হইল না। যাহা হউক আর্য্যগণ পুণ্যারণ্য ভারতক্ষেত্রে যখন তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং এক শ্রেণীর লোককে যত্ন সহকারে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত। ইহাঁরা বালক কাল হইতে ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতেন; যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম কার্য্যের সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আপনারা পল্লীগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান দেখিয়া থাকিবেন, ইহাঁরা বর্ণজ্ঞান-বিহীন, সংস্কৃত ভাষার বিন্দু বিসর্গ জানেন না; অথচ ইহাঁরা দশকর্ম্মান্বিত অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় তাহার সমুদায় প্রকরণ ইহাঁরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করুন পিতৃশ্রাদ্ধ কিরূপে করিতে হয়? অমনি ইঁহারা শ্রাদ্ধের মন্ত্র সকল অনর্গল বলিয়া যাইবেন। মধুবাতা ঋতায়তে প্রভৃতি মন্ত্র

সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক যেরূপ শিখিয়াছেন অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশকর্ম্মান্বিত লোক দৃষ্ট হয়, প্রাচীন আর্য্য সমাজেও বেদ মন্ত্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই উত্তরকালে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের বুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ যিনি ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন। প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থঃ—এক অর্থ ঈশ্বর, দ্বিতীয় অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি তৃতীয় অর্থ বেদ মন্ত্র। এখানে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ।

মনু কহিয়াছেনঃ—

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

মনু ১ম অধ্যায়।

"উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদমন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন ব্রাহ্মণ এই সমূদায় সৃষ্টির প্রভু।"

এইরূপে যখন প্রাচীন আর্য্য সমাজের একাঙ্গ সশস্ত্র হইয়া সমাজ রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং অপরাঙ্গ বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন

সমাজের অপর সকল লোক—ইহাঁদেরই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ছিল—কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া অর্থোৎ-পাদনে রত হইলেন। বেদে ইহাঁরা "বিশ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতে "সাধারণ প্রজা" এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে যেরূপ অর্থ বোধ হয় বেদমন্ত্র সকলে "বিশ" শব্দের সেই প্রকার অর্থ। বিশ অর্থাৎ প্রজাবর্গ। এই কারণে "বিশাম্পতিঃ" শব্দের অর্থ রাজা, যিনি প্রজাদিগের প্রভু।

দেখুন তবে কেমন অপরিহার্য্য কারণে আদিম আর্য্য-সমাজ মধ্যে চারি প্রকার জাতির সূত্রপাত হইল। প্রথম যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের যে তিনটী প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয় (১ম) নিম্ন জাতীয়দিগের অন্ন পান গ্রহণ নিষেধ, (২য়)ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ (৩য়)জাতির প্রভেদ অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা। আদিম আর্য্য-সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটীই লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রবল দলাদলি ও বৈরভাবের ফলস্বরূপ, সুতরাং এগুলি সামাজিক নিয়মরূপে পরিগণিত হইতে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল। বরং শাস্ত্রে এমন ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণগত নয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল

না, উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি, এবং হীনবর্ণের উত্তম বর্ণত্ব প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল পরে প্রদর্শন করিতেছি।

এখন একটী কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যসমাজে সাধারণ শিক্ষার যেমন রীতি দৃষ্ট হয় আদিম আর্য্যসমাজে তাহা কখনই ছিল না। অর্থাৎ এখন যেমন একটী বিদ্যালয়ে তুমি আমি দশজন আপনাপন অবস্থা ও শক্তি অনুসারে আমাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে পারি, দশদিক হইতে দশ শত বালক বালিকা আসিয়া প্রতিদিন শিক্ষা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত-সমাজে এরূপ বিদ্যালয় ছিল না। তখন বিদ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত, ও গুরুদিগের প্রতি কঠোর, শাসন ছিল, তাঁহারা ভৃতি বা বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, পরন্ত শিষ্যগণকে অন্ন দিয়া পুষিতে হইত। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস ও গুরুগৃহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। বিশেষ তখন বর্ত্তমান সময়ের মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না; মুদ্রা-যন্ত্র না থাকাতে অতিকষ্টে অনেক পরিশ্রম সহকারে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত; সুতরাং ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না। যে সকল ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতেন, বহুদূর হইতে শিষ্যগণ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিত। এইরূপ অবস্থায়

যাহার যে বিদ্যা ছিল তাহা শৈশব অবস্থা হইতেই নিজ বংশীয় বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে তাহা নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়। এই সকল কারণেই দেখিতে পাই এ দেশে সকল প্রকার বিদ্যাই কৌলিক হইয়া যায়। এখানে নৈয়ায়িকের ছেলে নৈয়ায়িক, স্মার্ত্তের ছেলে স্মার্ত্ত, দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদ্যের ছেলে বৈদ্য। যিনি যখন যে বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তিনিই তাহা নিজ বংশধরদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আপনারা এই বিষয়টী স্মরণ রাখিলেই কিরূপে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দেশ রক্ষাতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাতে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাদের বংশ-পরম্পরাতে থাকিল—যাঁহারা বেদমন্ত্র সকল রক্ষা ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কার্য্য তাঁহাদেরও কৌলিক কার্য্য হইল—যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারাও আপনাপন সন্তানদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখন কি পাঠকদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে বিদ্যা এ প্রকার কৌলিক হয়, অর্থাৎ যেটী বংশ-মর্য্যাদার একটী অঙ্গ-স্বরূপ হয়; লোকে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে, ও তদুপরি অপরকে

সহজে অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না। আপনারা সমাজ মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন সুতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য আর ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। যখন বেদ মন্ত্র রক্ষকগণ আপনাদের কর্ম্মের জন্য গৌরব ও স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষক ক্ষত্রগণ স্বীয় কার্য্যের গৌরব ঘোষনা করিতে লাগিলেন, তখন অল্পে অল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হইল। এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান কঠিন নিয়ম সকল দেখা দিল।

এক্ষণে আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন যে এই বিদ্বেষানল প্রধুমিত হইতে অল্প দিন লাগে নাই। তখন এই দীর্ঘকালের মধ্যে এমন সকল নিদর্শন নিশ্চিত পাওয়া উচিত, যদ্দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতেছে, বা পরস্পরের সহিত আহার বিহারাদি ও বিবাহাদি চলিতেছে? ইহার উত্তরে আমি পাঠকদিগকে ভুরি ভুরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে এরূপ ঘটনা সকল সর্ব্বদাই ঘটিত। প্রথমতঃ এ কথা ত পাঠকদিগের সকলেরই জানা আছে, যে ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র স্বীয় তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ আরও বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"করুষাৎ মানবাৎ আসন্ করুষাঃ ক্ষত্র-জাতয়ঃ।
উত্তরা পথ গোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্ম বৎসলাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

অর্থঃ—মনুর পুত্র করুষ হইতে কারুষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারা ক্ষত্রজাতীয়। ইহারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্ম-বৎসল ছিলেন। পুনশ্চ.—

"পৃষধ্রো হিংসয়িত্বাতু গুরো র্গাং জনমেজয়।'
শাপাৎ শূদ্রত্ব মাপন্নঃ॥"

হরিবংশ ৯ম অধ্যায়।

অর্থঃ—পৃষধ্র রাজা গুরুর গোহত্যা করিয়া শাপবশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অথবা হরিবংশে

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

অর্থঃ—নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র ইহারা দুইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপ আরও অনেক বচন দ্বারা আমরা ইহারই প্রমাণ পাই যে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, এক বর্ণের অপর বর্ণ প্রাপ্তি প্রায় ঘটিত। পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধ বা অন্নাদি ভোজনের ত কথাই নাই। এমন কি মনুসংহিতাকারের সময়ে, অনুলোম বিবাহের বিধি দৃষ্ট হয়।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চস্বাচাগ্রজন্মনঃ।

মনু ৩য় অধ্যায়।

অর্থঃ—শূদ্র কেবল একমাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে; বৈশ্য শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে

পারিবে।” ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্যা এবং বৈশ্য শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে; এবং ব্রাহ্মণ চারি জাতিরই কন্যা বিবাহ করিবে।” উচ্চ জাতীয় পুরুষে নিম্ন জাতীয় কন্যাতে যে বিবাহ হইত, তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত কিন্তু উচ্চ জাতীয় কন্যা ও নিম্ন জাতীয় পুরুষে যে বিবাহ হইত তাহা প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ নিতান্ত নিষিদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু মনু অনুলোম বিবাহের বিধি দিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের যেমন প্রমাণ পাঠকগণ পাইলেন সেই রূপ পরস্পরের অন্ন গ্রহণেরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রমাণের জন্য বড় অধিক দূরে যাইতে হইবে না। যে পরাশর স্মৃতি কলির ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতেই আছে ঃ—

“ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥”

অর্থঃ—যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্ ও শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা হব্যে কব্যে ভোজন করিবে।

যাহা হউক জাতিভেদের কঠোর নিয়ম সকল সৃষ্টি হইতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। নিতান্ত বৈরভাব ও দ্বেষাদ্বেষি না থাকিলে পরস্পর আহার বিহার ও বিবাহ সম্বন্ধ রহিত হয় না। বর্ত্তমান সমাজে আমরা কি দেখি? দুই গৃহস্থের মধ্যে যখন মনান্তর উপস্থিত হয়, যখন কোন কারণে

প্রবল শত্রুতা হয়, তখন তাহারা পরস্পরের সহিত আহার বিহার করে না। পরস্পরের আতিথ্য গ্রহণ একটা বিশেষ সদ্ভাবের কর্ম্ম। যেখানে সদ্ভাব নাই, প্রণয় নাই, বন্ধুত্ব নাই সেখানে মানুষ পরস্পরের আতিথ্য গ্রহণ করে না। আপনারা এখনও সর্ব্বদা দেখিতে পান দুই খানি গ্রামের মধ্যে যদি বিরোধ ঘটনা হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আর বিবাহ সম্বন্ধ থাকে না। প্রাচীন কালে সেইরূপ কারণেই বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে আহার বিহার ও আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদি বিবাদ বিসম্বাদ ঘটনা হইয়াই আহার বিহারাদি সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে ত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার কোন বিবরণ থাকা উচিত? এরূপ বিবরণ ভূরি ভূরি আছে। আমি তাহার কয়েকটী মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। (১ম) প্রথমতঃ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্টের মধ্যে যে বিবাদ ঘটনা হইয়াছিল তাহা আপনারা জানেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষির ঈর্ষ্যা ভাজন হইয়াছিলেন। এখানে দেখিতেছেন একজন ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। আবার পরশুরামের আখ্যায়িকাতে দেখুন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় রক্তে পিতার তর্পণ করিতেছেন। বেণ, নহুষ, নিমি প্রভৃতির

উপাখ্যানেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল উপাখ্যানের ন্যায় আরও অনেক উপাখ্যান আছে। পূরাকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-দলের মধ্যে যে বিবাদ ঘটনা হইয়াছিল তাহার অন্য প্রকার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী অংশেতে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত বচন কর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যথা

"তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরংনাস্তি তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তা দুপাস্তে রাজসূয়ে। ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি। শৈসা ক্ষত্রস্য যোনি যদ্‌ব্রহ্ম তস্মাৎ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্ততঃ উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং। য এনং হিনস্তি স্বাংসযোনি মৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি।"

অর্থঃ—অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই ; এই কারণে রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত্রিয়ের অধীন হইয়া উপা-সনা করিতে হয়। সে যশ ক্ষত্রিয়ই ধারণ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান সুতরাং ক্ষত্রিয় যদি পরম উন্নতিও প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বীয় উৎপত্তি স্থান ব্রাহ্মণ-কেই আশ্রয় করিবে। যদি কোন্ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে ক্লেশ দেয় সে আপনার উৎপত্তি স্থানকেই নষ্ট করে, সে পাপী হয়।"

ইহার ফলিতার্থ,—"তোমরা দুই দলে বিবাদ করিও না, এক দিক দিয়া দেখিলে ক্ষত্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ অপর দিক দিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, দুই দলেরই শ্রেষ্ঠতার কারণ আছে।" এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এইরূপ বিবাদ ও সংগ্রাম চলিয়া অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মতি-অনুসারে এই স্থির হয় যে ক্ষত্রিয়গণ দেশ-রক্ষা ও রাজ্য শাসন কার্য্য করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইবেন না। এই বিবাদ ও কলহের সময়েই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে ক্রমে আহার বিহারাদি বন্ধ হইয়া যায়।

এইরূপ সন্ধি স্থাপন হইয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ ও পরাক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমাজ সর্ব্বদা শাসিত হয় সেই শক্তি তাঁহাদের হস্তে থাকিল। ক্ষত্রিয় রাজা হইলেন কিন্তু মন্ত্রী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বিচারক হইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রাড়্বিবাক হইলেন; ক্ষত্রিয় রক্ষক হইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরু হইলেন; ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ক। বাহু অপেক্ষা মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ সুতরাং ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা দিন দিন নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপে প্রাচীন আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণদিগের শক্তি ও প্রতাপ যত নিরঙ্কুশ হইতে লাগিল ততই অপরাপর জাতি হীন দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এমন কি রাজগণও নাম মাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পরিচালক হইলেন। বৈশ্যগণ আরও হীন দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শূদ্রদিগের ত কথাই নাই। তাহারা সকল প্রকার সামাজিক শক্তি ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট ও পশু প্রায় হইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহাদের সামাজিক দুর্গতির সীমা পরিসীমা রহিল না। এই সামাজিক দুর্গতির পরিচয় কিরূপে দিব? মনু রচিত সংহিতা যে সময়ে সংকলিত হইয়াছিল, সেই সময়কে জাতিভেদের প্রকোপের পরাকাষ্ঠাকাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব সেই মনুসংহিতা হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন প্রাচীন আর্য্যসমাজে হতভাগ্য শূদ্র জাতির কতদূর দুর্গতি হইয়াছিল।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

"যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠ মন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনো রনুশাসনং॥

অর্থঃ—অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিবে তাহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে, ইহাই মনুর বিধি।

পুনশ্চ

"পাণিমুদ্যম্য দণ্ডংবা পাণিচ্ছেদন মর্হতি।

পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদন মর্হতি ॥"

মনু ৮ম অধ্যায়।

অর্থঃ—শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য যদি হস্ত কিম্বা দণ্ড উত্তোলন করে তাহা হইলে শূদ্রের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিতে হইবে; যদি কোপ বশতঃ পদ দ্বারা প্রহার করে তাহা হইলে পদ ছেদন করিতে হইবে ॥"

অপিচ—

সহাসন মভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ

কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ—

অর্থ ঃ—"শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠজাতির সহিত একাসনে বসিতে অভিলাষী হয়—তাহা হইলে তাহার কটিদেশে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে।"

কি ভয়ানক! উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসা দূরে থাকুক, যদি একাসনে বসিতে অভিলাষীও হয় তাহা হইলেও তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

উচ্চ জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে গেলে শূদ্রের প্রতি কি গুরুতর সাজা তাহা ত দেখিলেন; এখন একবার দেখুন, অপর সকল সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে শূদ্রদিগের কি দুরাবস্থা করা হইয়াছিল। যে সকল সামাজিক অধিকারকে মানুষ প্রিয় জ্ঞান করে, এবং যে সকল অধিকারের

অভাবে মানব জীবন ভার ও বিড়ম্বনাস্বরূপ হইয়া পড়ে; তন্মধ্যে নিজের কার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। অর্থাৎ যে কার্য্য আমার ভাল লাগিবে, যাহাতে আমার হৃদয়ের অনুরাগ হইবে, যাহাতে আমার কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিবে, আমি সেই কার্য্য করিব; আমি আমার শ্রমের অন্ন ঘরে আনিব; আমার দুঃখের অন্ন সুখের করিয়া স্বীয় স্ত্রী-পুত্র পরিবারগণের সহিত আহার করিব। হায়! অতি দীন দরিদ্র ব্যক্তিও এ আকাঙ্খা করিয়া থাকে, আমাদের সকলের ত মানবের দেহ, মানবের প্রাণ! আমরা হৃদয় দেখিয়া বিচার করিতে পারি। মানবের প্রাণ নিরুপদ্রবে নিজ ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নিজের শ্রমশক্তিকে চালনা করিয়া সংসারে সুখী হইতে চায় কি না? কিন্তু একবার প্রাচীন আর্য্য-সমাজের প্রতি দৃষ্টি-পাত করুন, তথায় কি দেখিবেন?

মনু বলিতেছেনঃ—

"শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেববা।
দাস্যায়ৈবহি সৃষ্টোসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

মনুসংহিতা ৮ম অধ্যায়।

অর্থ্য—শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।"।

পূনশ্চ।

"নস্বামিনা নিসৃষ্টোপি শূদ্রো দাস্যা দ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজংহি তত্তস্য কস্তস্মা ত্তদপোহতি ॥

মনু ৮ম অধ্যায়।

অর্থঃ—"স্বীয় প্রভু যদি শূদ্রকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন তাহা হইলেও শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না; কারণ দাসত্ব তাহার স্বভাবজাত কে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে?"।

একবার আপন আপন হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া দেখুন। আমি চাই এক কার্য্য করিতে আর একজন যদি বলপূর্ব্বক আমাকে অন্যবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহা হইলে মানবাত্মার পক্ষে সে অবস্থা কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক? ইচ্ছামত কার্য্য, রুচি অনুসারে শ্রম, ও শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম এ অধিকার-টুকুও যদি মানবের না থাকে তাহা হইলে জীবন কিরূপ ভারস্বরূপ হয়?' কিন্তু প্রাচীন আর্য্য-সমাজের ব্রাহ্মণগণ শূদ্র-দিগকে এই ঘোর দাসত্বে পরিণত করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। ধনোপার্জ্জনের অধিকার মানবজীবনের আর একটী প্রিয় অধিকার তাহা হইতেও শূদ্রদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

দেখুন মনু কি বলেনঃ—

"বিশ্রদ্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
নহিতস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বংভর্ত্তৃহার্য্য-ধনোহিসঃ ॥"

মনু ৮ম অধ্যায়।

অর্থঃ—"শূদ্র যদি কোন দ্রব্য উপার্জ্জন করে ব্রাহ্মণ অসঙ্কোচে সমুদায় কাড়িয়া লইবেন, কারণ শূদ্রের ধনে অধিকার নাই; সে যে কিছু উপার্জ্জন করিবে সে সমুদায় তাহার প্রভুর।"

পুনশ্চ—শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধন মাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥"

অর্থঃ—শূদ্র যদি কৃতীও হয় তথাপি সে ধন-সঞ্চয় করিবে না। কারণ শূদ্রের হস্তে ধন-সঞ্চয় হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবে।"

পাঠক আর কি শুনিতে চান? শূদ্র ধনশালী হইলে পাছে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হয়, পাছে তাঁহাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের হানি হয় এই জন্য শূদ্র কৃতী হইলেও ধনসঞ্চয় করিবে না। শূদ্র ইচ্ছামত শ্রম করিতে পারিবে না; ইচ্ছা মত বিশ্রাম করিতে পারিবে না; স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিবে না; শরীরের রক্ত জল করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করিবে তাহাতে তার অধিকার থাকিবে না; পাছে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের হানি হয় এজন্য ধনসঞ্চয় করিবে না। কি ভয়ানক বিধি? অপেক্ষা করুন আরও আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যদি এখানেও ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও এক প্রকার হইত। ধর্ম্মে মানব মাত্রেরই অধিকার; যদি সেই ধর্ম্মে শূদ্রদিগের অধিকার দিতেন তাহা হইলেও বলিতাম, যে না প্রাচীন আর্য্য-সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ মানবকে

নিতান্ত পশুপ্রায় ব্যবহার করিতে বলেন নাই, কিন্তু বলিতে গভীর ক্ষোভে মন আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে, দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হইতেছে, লজ্জায় মস্তক অবনত হইতেছে, শূদ্রকে সমুদায় সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না; কিন্তু তাহাদের পশুত্বকে পরিসমাপ্ত করিবার জন্য, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে ধর্ম্মের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিলেন। শুনুন মনু কি বলিতেছেন;—)

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ নচ সংস্কার মর্হতি
ন চাস্যাধিকারো ধর্ম্মেস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥"

মনু ১০ম অধ্যায়।

অর্থ—শূদ্র যে কোন দুষ্কার্য্য করুক না কেন, তাহার পাতক নাই; শূদ্রের কোন প্রকার ধর্ম্ম-সংস্কার নাই; তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, সুতরাং ধর্ম্ম হইতে নিষেধও নাই।"

কি সর্ব্বনাশ! আমরা যাহাকে দুষ্কর্ম্ম বলি, পশুগণ তাহা করে অথচ তাহাদের পাপ নাই; কারণ তাহারা ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন নয়, সেইরূপ শূদ্র যদি গুরুতর দুষ্কার্য্য করে তাহার পাতক নাই, কারণ তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই।"

হা ভগবান! মানুষ হইয়া কি মানুষকে এতদূর পীড়ন করিতে পারে? তুমি যে ভ্রান্ত যুবক শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া পাগল, প্রতি পদে শাস্ত্রের দোহাই দেও, তুমি দেখ তোমার শাস্ত্রে কতদূর আছে। এই কি শাস্ত্র? এই কি ধর্ম্ম? এই

যদি ধর্ম্ম হয় তবে অধর্ম্ম কি? মানবকে যাহাতে পশু করিবার আদেশ দেয় সেই কি শাস্ত্র? যদি কোথাও নরককুণ্ড থাকে,তবে শাস্ত্রের এই অংশকে সেই নরককুণ্ডে নিক্ষেপ কর। শাস্ত্রের সেই অংশকে পোড়াইয়া ভস্ম কর, এবং সেই ভস্ম কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর। আমি হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করি যে ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রতাপের দিন খর্ব্ব হইয়াছে; শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণের সেই প্রতাপ প্রবল থাকিলে কি রক্ষা ছিল? তাহা হইলে বাঙ্গালি-সমাজের বর্ত্তমান দলপতিগণ কোথায় থাকিতেন। আজ অপরাহ্নে যে আমরা কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের মৃতদেহ চিতানলে সমর্পণ করিয়া আসিলাম, তাহা হইলে এই কৃষ্ণদাস পাল কোথা থাকিতেন। আজ কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর দিন, আজ বঙ্গীয় যুবক সরলভাবে সত্যপ্রিয় লোকের ন্যায় বল দেখি, জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হইয়া তোমার দেশের কল্যাণ হইয়াছে কি অকল্যাণ হইয়াছে। তুমি কি এই সকল রহিত করিয়া আবার সেই প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাও? তোমার কি তাহা করিবার শক্তি আছে? তুমি কি কালের এই প্রবল গতিকে নিয়মিত করিতে পার? তুমি কি এই পরিবর্ত্তন স্রোতকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পার? যদি তুমি ইহা পার তবে তুমি কনিষ্ঠ-অঙ্গুলির উপরে গোবর্দ্ধনও ধারণ করিতে পার। নাই, নাই, সাধ্য নাই, তোমাদের

একজনের কেন লক্ষ জনেরও সাধ্য নাই, যে সভ্য সমাজের বিকাশোন্মুখ শক্তি সকলকে বাধা দিতে পার? দেখ না কি চির পরাধীন, চির বন্দীকৃত জাতিসকলের মুক্তির জন্য বিধাতার বিধি প্রচার হইয়াছে, কার সাধ্য এই বিধির প্রতিকূলতা করে, দেখ জাতিভেদের আসন্ন কাল উপস্থিত। বলিতে গেলে এখন জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারা দুই সমান। বিশ্বাস কর, জাতিভেদের মৃত্যুদিন ঘনাইয়া আসিতেছে; এমন ঔষধ নাই যাহাতে ইহার জীবনকে আর রক্ষা করিতে পারে। আর যদিই তোমরা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল প্রাচীন ব্যবস্থা পুনর্জ্জীবিত করিতে চাও কি না? আমি নিশ্চয় জানি তোমরা তাহা চাও না। কারণ শাস্ত্রে কোন্ কালে কবে শুনিয়াছ যে নিম্নজাতীয় ব্যক্তি উচ্চজাতীয়দিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়? মনু বলিয়াছেন নিম্নজাতীয় ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ঘৃত অগ্নিবর্ণ করিয়া তাহার গলদেশে ফেলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দেখ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণ এখন ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছে। কত কত ব্রাহ্মণ যুবক ইহাঁদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। এই জন্যই বলিতেছি জাতিভেদ আর নাই। তোমরা তাহা মান না।

জাতিভেদ প্রথার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা কিরূপে উপস্থিত

তাহাও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। মনুস্মৃতি হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহা শুনিয়া সকলেই অনুভব করিতেছেন যে ইহার অপেক্ষা সামাজিক অত্যাচার হইতে পারে না। ইতিহাসে মানব-সমাজের গতিবিধি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সামাজিক অত্যাচার যখন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে; সেই দুর্ব্বহ ভারে নরনারীর প্রাণ যখন পিষিয়া যাইতেথাকে, তখন সেই দারুণ সামাজিক ব্যাধির মধ্য হইতেই তাহার ঔষধ দেখা দেয়। অবশেষে পদদলিত মানব-প্রকৃতির প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে; ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সকল সময়ে সচরাচর দেখা যায়, এক এক জন অপ্রতিম প্রতিভা-সম্পন্ন মহাপুরুষ অভ্যুত্থিত হন; শত শত লোকে গোপনে যে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল তাহা ইহাঁরা দর্শন করেন; শত সহস্র হৃদয়ে যে ক্রোধাগ্নি প্রধুমিত হইতেছিল তাহা ইহাঁদের হৃদয়ে প্রচণ্ড দাবানলের আকার ধারণ করে, শত সহস্র অন্তরে যে বাসনা জাগিতেছিল, তাহা ইহাঁদের প্রাণে ঘনী-ভূত হয়। ইহাঁরা নিগৃহীত পদদলিত প্রপীড়িত জাতি সকলের প্রতিভূ ও মুখ-স্বরূপ হইয়া সিংহগর্জ্জনে জগৎকে কম্পিত করিতে আরম্ভ করেন; জগতের সমবেত শক্তি-সকলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া সত্যের ও ন্যায়ের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া দেন; এবং বজ্র-দৃঢ় মুষ্টিতে অত্যা-চারীর সিংহাসনের পায়া ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া চূর্ণ

করিবার প্রয়াস পান। উহাঁরা মনুষ্য কুলে বীর। রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করিবার জন্য ইউরোপে এইরূপ এক বীরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহার নাম মার্টিন লুথার। ফরাসি বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর সেখানে কি দেখিবে? ধনিদিগের অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, একদিকে ফ্রান্সের দীন দরিদ্র প্রজাকুল এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, অপরদিকে ধনিগণ নিজ নিজ প্রাসাদে বিলাসিনীগণ সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন; একদিকে প্রজাকুল ক্ষুধাতুর কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে ও কীট পতঙ্গের ন্যায় পথে ঘাটে পড়িয়া মরিতেছে, অপরদিকে ধনিগণ তাহাদের দুর্দ্দশার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বরং তাহাদিগকে ঘৃণাসূচক ভাষায় দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। এই ঘোর বৈষম্য, এই ঘোর দুর্দ্দশা, এই ঘোর সামাজিক অত্যাচার যখন দুর্ব্বহ ভারের ন্যায় হইয়া উঠিল, তখন গগণ মেদিনীকে বিকম্পিত করিয়া ঈশ্বরের এই বাণী প্রচারিত হইল—"অভ্যুত্থান কর, বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন কর"। কি! আমি এসব নররুধিরময় বিদ্রোহকেও ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিতেছি! হাঁ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ঈশ্বর অত্যাচারকারীর অত্যাচারের মধ্যেই তাহার শাস্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্রোহীগণ যে অকারণ নিষ্ঠুরতা করিয়াছে, যে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, যে পশুবৎ আচরণ করিয়াছে, যে রুধির স্রোত

বর্ষণ করিয়াছে, সে জন্য শোক করি, মানব প্রকৃতি দুর্ব্বল বলিয়া লজ্জা পাই, কিন্তু সেই সমুদায় রক্তপাত, নৃশংসতা ও পাপাচরণের পশ্চাতে দেখিতে পাই ঈশ্বর অত্যাচারিদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছেন। সেইরূপ প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণদিগের প্রবল প্রতাপে হীনজাতি সকল যখন কাঁপিতে লাগিল, রাজাদের শক্তি পর্য্যন্ত যখন নামমাত্রে পরিণত হইল, আধ্যাত্মিক দাসত্বে প্রজাকুলের মনুষ্যত্ব যখন বিলীন প্রায় হইল, মানব যখন পশু প্রায় হইয়া পড়িল, তখন ঈশ্বর আদেশ করিলেন—"উত্থান কর।" অমনি যুবরাজ সিদ্ধার্থ সত্যের মশাল হস্তে ধরিয়া ভারতান্ধকার মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ কে আসিল বলিয়া ভারতক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বুদ্ধ যেমন একদিকে রাজ সম্পদকে পায়ে ঠেলিলেন, অপরদিকে ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক প্রভুত্বের উপরেও খড়্গাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেনঃ—"হে পদদলিত নিপীড়িত জাতি সকল আমার নিকট আগমন কর। আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন দিতেছি। আমার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, ইহার তলে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পুরুষ রমণী, ধনী দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, সকলে সমভাবে বাস করিবে।" সত্যের বিজয় ভেরীর নিনাদের সহিত এই মহা ঘোষণা যখন প্রচারিত হইল তখন ভারত-সমাজ উত্তপ্ত পাকপাত্রের ন্যায় টগ বগ্ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। এক পুরুষরত্নকে প্রসব করিয়া ভারতভূমি আর ঘুমাইতে

পারিল না। বুদ্ধের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভারতসমাজে দুইটী প্রধান বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। প্রথমতঃ সেই দিন হইতে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল। যেমন ইউরোপে মহামতি লুথার একবার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করাতে সেই স্বাধীনতা প্রবৃত্তি চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিল; লোকে নিজের ধর্ম্মজ্ঞান অনুসারে কাজ করিতে শিখিল; ভারতবর্ষেও সেই দশা ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপে প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদের পথ খুলিয়া দিলেন। তদবধি চারিদিকে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা উড়িতে আরম্ভ হইল। পরিশেষে ভারতসমাজ অগণ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের দিন হইতে নীচ জাতীর লোকদিগের উন্নতি আরম্ভ হইল। দলে দলে নিকৃষ্ট বর্ণের লোক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে শ্রমণ শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি যে ভারতবর্ষে এককালে মনু শূদ্র রাজ্যে বাস করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম হইতে তিনশত বৎসরের মধ্যে শূদ্রের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইরূপে মহাত্মা শাক্য সিংহ ভারতসমাজে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণদিগের শক্তি প্রবল আঘাত পাইল বটে, জাতিভেদের কঠোর নিয়ম সকল কিঞ্চিৎ শিথিল হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব একেবারে

বিলুপ্ত হইল না। দেশে হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব রহিল। পাটলীপুত্রের রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপরাপর প্রদেশের রাজারা হিন্দু ধর্ম্মের যাজন করিতে রত থাকিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ রাজাদিগের ভুজবলের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তখনও কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল।

জাতিভেদের উপরে দ্বিতীয় আঘাত মুসলমান রাজারা দিলেন। ইহাঁরা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। ইহাঁরা বলিলেন তোমাদের জাতিভেদ আমরা বুঝি না; আমাদের কার্য্য যে করিতে পারিবে আমরা তাহা-কেই পুরস্কার দিব।" ব্রাহ্মণগণ জাত্যহংকারে স্ফীত হইয়া এই ম্লেচ্ছদিগের অনেক দূরে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং শূদ্র-গণ ও অপরাপর নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইয়া ইহা-দের অধীনে রাজ কার্য্য সকল গ্রহণ করিলেন এবং ইহাঁদের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে দুইটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ মুসলমানদিগের সংশ্রবে আসিয়া এই সকল হিন্দু মুসলমানদিগের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে লাগিল; প্রতিনিয়ত পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধ কথা রাজাদিগের নিকট শুনিয়া ইহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থার হ্রাস হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হীন জাতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তে ধন সঞ্চয় হইতে লাগিল। ইহাঁরা অনেকে মুসলমান রাজাদিগের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া জমিদারি লাভ করিতে লাগিলেন। একদিকে

শূদ্রগণের পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়া তাহারা সমাজে দলপতি হইতে লাগিলেন, অপর দিকে পারসী বিদ্যার বহুল প্রচার হওয়াতে এবং সংস্কৃত বিদ্যার অনাদর হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-দিগের বিদ্যা বুদ্ধি হ্রাস হইয়া তাঁহারা ধনী শূদ্রদিগের বিদায় প্রার্থী ও পরভাগ্যোপজীবী হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন ইংরেজেরা এদেশে পদার্পণ করিলেন। নূতন রাজারা মুসলমান রাজাদিগের ন্যায় প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপর হাত দিলেন না, কিন্তু সমাজ মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন যে তাহাতে সমাজের ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রথমতঃ সকল শ্রেণীর জন্য ইহাঁরা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বিদ্যাদান বিষয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার করিলেন না। চিরদিনের পদদলিত জাতি সকল যখন ইহাঁদের গ্রন্থাদিতে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের কথা পাঠ করিতে লাগিল, স্বাধীনতার সংগ্রাম সকলের বিবরণ পাঠ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের অন্তরে এক প্রকার নবজীবনের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল এক নবরাজ্য এক নূতন উন্নতির পথ তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত। ইহা দেখিয়া তাহারা আগ্রহের সহিত ধাবিত হইল। ক্রমে ছুতার, গোয়ালা, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক, সকলেই ইংরাজের বিদ্যালয়ে স্বীয় স্বীয় ছাত্রদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিল।

সকলের সন্তান এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল, একাসনে বসিতে লাগিল, এক সঙ্গে খেলিতে লাগিল, একপ্রকার পদ লাভ করিতে লাগিল। ইহার অপেক্ষা অধিক সাম্যের শিক্ষা কিসে হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানেরর চর্চ্চা যতই হইতে লাগিল ততই লোকের হৃদয় মনের বিকাশ হইতে লাগিল। প্রাচীন কুসংস্কার সকল তাড়াইবার জন্য মুসলমান রাজারা তরবার ধরিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তরবার ধরিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই বর্ত্তমান রাজারা বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার অধিক করিলেন। বিনা তর্কে বিনা প্রচারে, বিনা সংগ্রামে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কুসংস্কাররাশি বিদূরিত হইতেছে। ঈশ্বর এক জনকে ব্রাহ্মণ, একজন শূদ্র করিয়াছেন একথা একজন দ্বাদশবর্ষীয় স্কুলের ছাত্রেরও নিকট উপহাসের কথা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হওয়াতে সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়া আপামর সাধারণ সকলের হস্তে অর্পিত হইতেছে। যে শাস্ত্ররূপ অস্ত্র লুক্কায়িত রাখিয়া ব্রাহ্মণগণ হীন জাতীয়দিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা এখন ঐ হীনজাতীয়দিগের হস্তে পড়িতেছে। প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। এখন কি দেখিতেছি? শূদ্র দূরে থাক ম্লেচ্ছগণ বেদের উদ্ধার কর্ত্তা হইয়াছেন এবং আমাদিগকে

তাঁহাদের নিকট বেদ বেদাঙ্গের অর্থ শিক্ষা করিতে হইতেছে।

এই সকল কারণে বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ প্রথা দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান ইংরাজী সভ্যতার ন্যায় ইহার আর শত্রু নাই। বলিতে গেলে জাতিভেদ প্রথার উপর আর আমাদের আক্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজী শিক্ষা ইহার তলে ঘুণ হইয়া লাগিয়াছে এবং ত্বরায় ইহাকে বিনষ্ট করিবে। আপনারা কি দেখিতেছেন? বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি? এই কলিকাতা সহরে এমত কত শত হিন্দু সন্তান আছেন, যাঁহারা প্রতিদিন ইংরাজদিগের হোটেলে অভক্ষ্য দ্রব্য সকল আহার করিতেছেন অথচ তাঁহারা অবাধে সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহারাই অনেক স্থলে সমাজ পতি ও দলপতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তবে আর জাতিভেদ কোথায়?

এখন দেখা যাউক এদেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকাতে কি কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু অনিষ্ট ফলের গণনার পূর্ব্বে, ইহার ইষ্ট ফল যদি কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখা আবশ্যক। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার জাতিভেদ প্রথার পক্ষ সমর্থন করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জাতিভেদের সপক্ষে তিনি কি বলেন, দেখিবার জন্য আমি মনোযোগ পূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ

করিয়াছিলাম। তিনি কতকগুলি ইষ্ট ফলের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। আমি অগ্রে উক্ত দুইটীর উল্লেখ করিব। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন হিন্দুদিগের নীতি অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। অন্যান্য দেশের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়—তবে দেখিতে পাই নীচ শ্রেণীর লোকদিগের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা কি শোচনীয়। পানাসক্তি ও ব্যভিচার তাহাদের মধ্যে কি প্রবল! এই উভয় পাপে সেই সকল জাতিকে পশু প্রায় করিয়া রাখিয়াছে। জাতিভেদের কঠোর শাসন নিবন্ধন উক্ত উভয় পাপ হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রবল হইতে পারে নাই। এই কথার মূলে গেলে, ইউরোপের সভ্য সমাজ সকলের সভ্যতার সহিত প্রাচীন ভারতসমাজের সভ্যতার একটী প্রভেদ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈষয়িকসুখ-প্রধান সভ্যতা। যাহাতে মানবের দিনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা করে না, শারীরিক সচ্ছন্দ বৃদ্ধি করে না, কায়িক ক্লেশের লাঘব করে না, ধনাগমের নব নব দ্বার উন্মুক্ত করে না, কিম্বা চরমে ধনাগমের নূতন দ্বার উন্মুক্ত করিবার সম্ভাবনা যাহাতে নাই, এমন বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ মনোযোগী নহেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চা, সাহিত্য চর্চ্চা, রাজনীতি চর্চ্চা সকলেরই উদ্দেশ্য ঐহিক সুখ বৃদ্ধি। ইংলণ্ডে এই বিষয়-তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল। যদি আজ

জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটী নব সত্য আবিষ্কৃত হয় একটী নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয় অমনি ইংরাজ পণ্ডিতগণ ভাবিতে বসিবেন তদ্দ্বারা বাণিজ্যের কতদূর সুবিধা হইতে পারে। যদি জড়ের কোন নূতন শক্তি প্রকাশ পায়, অমনি তাঁহারা চিন্তা করিতে বসিবেন তদ্দ্বারা কোন নূতন ব্যবসা খোলা যায় কি না? ইউরোপের সভ্যতা বিষয়-সুখ প্রধান সভ্যতা? প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা নীতি-প্রধান ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা। প্রাচীন কালের দর্শন শাস্ত্র, প্রাচীন কালের পুরাণ ইতিহাস, সকলের একই উদ্দেশ্য; মানবকে মুক্তিলাভে সমর্থ করা। মুক্তি কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই ষড় দর্শনের সৃষ্টি। অন্যান্য দেশে যাহার নাম আইন ভারতবর্ষে তাহার নাম ধর্ম্ম-শাস্ত্র। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, ধর্ম্মের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের কতদূর দৃষ্টি ছিল।

ভারতীয় সভ্যতা নীতি প্রধান ও আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন সভ্যতা হইল কেন? এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণগণ অনন্য-কর্ম্মা হইয়া কেবল ধর্ম্ম চর্চ্চা, ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্ম যাজন ও ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সমাজ মধ্যে তাঁহাদের প্রভুত্ব সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবের ছবি সমগ্র সমাজের উপরে দৃঢ়তর রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চাতে নিযুক্ত

হইতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ না থাকিলে কার্য্যের বিভাগ থাকিত না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রম ও কার্য্যের বিভাগ বর্ত্তমান সকল সভ্য-সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ। এই শ্রম বিভাগ দ্বারা সকল বিষয়েই আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছেন; এক শ্রেণী শিল্প সাহিত্যের অনুসরণ করিতেছেন; এক শ্রেণী ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এইরূপে কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়া স্বেচ্ছাতে মানবগণ বিবিধ কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন। সুতরাং প্রাচীন ভারত-সমাজে জাতিভেদ যে কার্য্য করিয়াছিল তাহার জন্য বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ প্রথার প্রয়োজন নাই।

উক্ত ইংরাজ দ্বিতীয় কথা এই বলিয়াছেন যে জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে ভারতবর্ষের জাতি সকল বিদেশীয় জেতা-দের সংশ্রবে আসিয়া লোপপ্রাপ্ত হইত। তিনি ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নীলগিরির টোডা জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন টোডাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে তাহারা নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের সংশ্রবে আসিয়া ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। টোডারা যে নিঃশেষ হইতেছে তাহা জাতিভেদের অভাব নিবন্ধন নহে। কিন্তু উক্ত জাতির আলস্য, বুদ্ধি সম্বন্ধে হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন। জীবন সংগ্রামে অপর সকল জাতিদিগের দ্বারা পরাস্ত হইয়া তাহারা দিন

দিন ঘোর দারিদ্র্যে নিপতিত হইতেছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এই কারণে দারজিলিঙ্গে লেপচাদিগের সংখ্যাও বোধ হয় হীন হইতেছে। অপর দিকে ব্রহ্মদেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়। ব্রহ্মদেশবাসী-গণের মধ্যে জাতিভেদ নাই। কোন ব্রহ্মদেশীয় রমণী যদি একজন ইউরোপীয়ের সহিত পরিণীতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাত্যংশে হীন হইতে হয় না। বৈধব্য হইলে বা কোন কারণে সে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে সে রমণী পুনরায় আপনার জাতি-কুটুম্বের মধ্যে অবাধে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মদেশবাসী অনেক ইউরোপীয়ের ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রী আছে। কই ব্রহ্মদেশীয়েরা ত এই কারণে উৎসন্ন যাইতেছে না।

যাহা হউক একণে জাতিভেদের অনিষ্টফল কি কি ঘটিয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম অনিষ্ট ফল। এই প্রথা ভারত-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ও অনাত্মীয়তার বীজ বপন করিয়াছে। ইহারই জন্য, "মানুষ মানুষের ভাই" এই মহাসত্য ভারতবাসীর মনে আপনার বল প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই প্রথা নিবন্ধন এক প্রদেশের ও এক জেলার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকার। পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই, সুতরাং আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই। চিন্তা করিয়া দেখ এই সহরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ-

গণ স্বুবর্ণবণিকদিগকে কিরূপ ঘৃণা করেন। জাতিগত ঘৃণা যেখানে, আত্মীয়তা সেখানে কোথায়? তৎপরে আর একটু দূরে দৃষ্টি ফেলিয়া দেখ—দেশের কি শোচনীয় দুরবস্থা। চব্বিশ পরগণার লোক যদি কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুরে গিয়া থাকে, সেখানকার লোকদিগকে ঘৃণা করে; বাঙ্গালীগণ যদি বেহারে থাকে, বেহারিদিগকে ঘৃণা করে; পঞ্জাবের বাঙ্গালি-দিগকে পঞ্জাবীরা ঘৃণা করে, বাঙ্গালিগণ পঞ্জাবীদিগকে হীন বলিয়া অবজ্ঞা করে। এই যত প্রকার অমিত্রতা যত প্রকার জাতি বা শ্রেণীগত বিদ্বেষ ইহার মূলে জাতিভেদ। বিবাহ সম্বন্ধই দুই দল লোকের মধ্যে আত্মীয়তা বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়, ইহা আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রাচীন রোমানদিগের সহিত তাহাদের প্রতিবেশী স্যাবাইনদিগের কিরূপ শক্রতা ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যখন রোমীয় যুবকগণ শক্রজাতীয় কতকগুলি রমণীকে হরণ করিয়া আনিল এবং তাহাদের সহিত পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইল তখন সেই রমণী-গণের দ্বারাই শক্র জাতির সহিত আত্মীয়তা ও প্রণয় স্থাপিত হইল। ইতিহাসের শরণাপন্নই বা হই কেন? আপনারা কি অনেকবার দেখেন নাই, যে দুইটী গ্রামের লোকের মধ্যে ঘন ঘন বিবাহ-সম্বন্ধ হয় সেই দুই গ্রামের মধ্যে কেমন আত্মীয়তা। যে গ্রামে মাসী বা পিসী বা ভগিনী দশজন আছেন, সে গ্রাম আমার কত ভালবাসার স্থান;

তাহার লোকের সঙ্গে আমার কত আত্মীয়তা। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন ভারতবর্ষে এই আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। যেস্থলে আত্মীয়তা নাই, সেস্থলে লোকে অপরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয় না। আজ যদি আপনারা শুনিতে পান যে মান্দ্রাজ সহরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বা মারীভয় হইয়া দলে দলে লোক মরিতেছে, তাহা হইলে স্বদেশ বলিয়া সাধারণভাবে আপনাদের সকলেরই কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবে; আমার হৃদয়ে বিশেষ আঘাত লাগিবে, কারণ আমার অনেকগুলি বন্ধু ও আত্মীয় লোক তথায় আছেন। আবার আমার সেই ক্লেশ আরও ঘনতর হইত, যদি সেখানে আমার দুই চারিজন মাসী, পিসী কি ভগিনী থাকিতেন। ইহা আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যত আত্মীয়তা ততই সমদুঃখসুখতা। জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতি সকলের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে দেয় নাই। এই আত্মীয়তা ও ঐক্যের অভাবই ভারতবাসীদিগের দুর্গতির প্রধান কারণ—ইহার জন্যই ভারতবর্ষ এত সহজে বিদেশীয় জাতিদিগের দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

একবার পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিবার সময় একজন উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত আমার একবার ভারতবর্ষের ভাবী অবস্থার বিষয়ে আলাপ হয়। উক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন আমার অনুমানে বোধ হয় তুমি বঙ্গদেশের লোক।

আমি বলিলাম হাঁ। আমি পঞ্জাব ভ্রমণের উদ্দেশে আসিয়াছি।

ইউরোপীয় কর্ম্মচারী বলিলেন, আচ্ছা এস আমরা তোমাদের দেশের ভাবী অবস্থার বিষয়ে কথা কই।

আমি বলিলাম ও বিষয়টা রাখিয়া দিলে ভাল হয় না? কারণ ও বিষয়ে আমাদের মত ভেদ উপস্থিত হইয়া কথোপকথনের সুখের ব্যাঘাত হইবে।

তিনি বলিলেন। না না, বিবাদ করা ত আমার উদ্দেশ্য নয়।

তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাদিগকে যে ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছেন তাহার গুণে আমাদের অন্তরে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়াছে।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ তোমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছ যখন আমরা এ দেশ হইতে যাইব।

আমি হাসিয়া বলিলাম—হাঁ তা বই কি? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা যে আমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাও?

আমি বলিলাম। না, তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে সে সম্ভাবনা দেখি না এবং সেই জন্যই মনে ক্লেশ হয়।

তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে বাহুবলশালী ও সমর কুশল লোক নাই তাহা নহে, দেখ তোমা-

দেরই লোকের দ্বারা তোমাদিগকে শাসনে রাখিয়াছি। বলের অভাবের জন্য তোমরা আমাদের অধীন নও, কিন্তু আর এক কারণে। তোমাদের মধ্যে এমন একটী বিষয় আছে যে জন্য তোমাদিগকে এক হইতে দিবে না এবং তোমরা আমাদিগকে তাড়াইতে পারিবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বিষয়টী কি?

তিনি বলিলেন—তাহা জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা বাঁচিয়া থাক্‌, আমাদিগকে এদেশ হইতে তাড়ায় কাহার সাধ্য?

বাস্তবিক এই জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতি সকলের মধ্যে আত্মীয়তা ও সমদুঃখসুখতা বৰ্দ্ধিত হইতে দেয় নাই। এই কারণেই ভারতবাসিগণ এত দুৰ্ব্বল।

জাতিভেদের দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল এই হইয়াছে যে এতদ্বারা কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্যকে নিকৃষ্ট ও লোকের চক্ষে হেয় করিয়াছে। এ দেশে কায়িক শ্রম চিরদিন হীন জাতিরাই করিয়া আসিতেছে; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণেরা সে সকল কার্য্যকে তাহাদের অযোগ্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেশে এই প্রথা চিরদিন প্রচলিত থাকাতে কায়িক শ্রমের প্রতি ভদ্রলোকের ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এই কারণে দেখিতে পাই এদেশে শিক্ষা বা অন্য কোন কারণে যাহারই অবস্থা একটু ভাল হয় সে এবং তাহার পুত্র পৌত্রগণ অমনি কায়িক শ্রমকে ঘৃণিত বলিয়া অনুভব

করিতে থাকে। এই ব্যাধি এতদূর পর্য্যন্ত প্রবল, যে একজন ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তান অর্থাভাবে সপরিবারে অর্দ্ধাশনে থাকিবে অথচ কোন প্রকার কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের ত কথাই নাই কোন ব্রাহ্মণ ভিখারীকে যদি দোষ দেওয়া যায় সে বলে মহাশয়! ব্রাহ্মণের সন্তান খাটিয়াও খাইতে পারি না সুতরাং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। ভিক্ষাতে ব্রাহ্মণের লজ্জা কি! কি ভয়ানক যে দেশে মনুষ্যোচিত কায়িক শ্রম অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসার বিষয় সে দেশকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করে কার সাধ্য? হে ভারতীয় যুবক! তুমি যত দিন সাহসী, কর্ম্মঠ, স্বাধীনচেতা, মনুষ্যের ন্যায় নিজের মস্তকের ঘর্ম্মে নিজের অন্ন উপার্জ্জন করিতে না শিখিবে, জগদীশ্বর তোমাকে যে বাহুদ্বয় ও পদদ্বয় দিয়াছেন তাহাদিগকে খাটাইয়া নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টা না করিবে ততদিন তোমার দুর্গতি দূর হইবে না। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখিতে পাইবে, যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ যখন প্রবল ছিল তখন এদেশে শ্রমজীবিদিগের উন্নতি হইতে পারে নাই। এদেশে শিল্পের যে সকল আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ বৌদ্ধ রাজাদিগের রাজ্যকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখনই ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ খাট হইয়াছে তখনই শ্রমজীবী ও শিল্পের উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে।

জাতিভেদের তৃতীয় অনিষ্ট ফল এই যে, ইহাতে ভারত-

বর্ষকে দরিদ্র করিয়াছে। এই প্রথা নিবন্ধন সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে নাই। সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত কোন্ দেশ কবে বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে? বোম্বাই নগরে গিয়া দেখ এদেশের লোকে কত কাপড়ের কল চালাইতেছেন। তাঁহারা প্রতিদিন রাশি রাশি সুতার নুটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কারখানাতে স্তূপাকার করিতেছেন। কিন্তু সেই সকল সুতার নুটী কোথায় বিক্রয় হইতেছে? কেন, বোম্বাইয়ের বাজারে। কে ক্রয় করিতেছে? কেন ইউরোপীয় বণিকগণ ঐ সকল সুতা ক্রয় করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। একজনেরা সুতা প্রস্তুত করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া সেইগুলি লইয়া আর একজনের নিকট বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া গেল। জাতিভেদ প্রথা থাকাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সে লাভ করিতে পারিলেন না। এই জন্য ভারতবাসীদের এত দারিদ্র্য।

চতুর্থতঃ, এই প্রথা নিবন্ধন এদেশের লোকের এত শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে; রক্তের বিমিশ্রণ হইতে পারে নাই। ইহা একটী প্রাণি জগতের পরীক্ষিত সত্য যে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে যদি ক্রমাগত বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সে জাতি ত্বরায় হীন তেজ

হইয়া যায় এবং কালে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়। দুইটী হাঁস পোষ, তাহাদিগকে এমন স্থানে লইয়া যাও যেখানে অন্য হাঁস নাই। এই দুইটী হাঁসের যে বংশ তাহাদেরই মধ্যেই বংশ বৃদ্ধি চলুক, আর বাহিরের হাঁস আনিও না। কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখিবে হাঁসগুলি দুর্ব্বল, নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আরও কয়েক পুরুষ পরে দেখিবে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গেল। রক্তের বিমিশ্রণাভাবে যে শারীরিক দুর্ব্বলতা তাহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা নিরর্থক। আবার অপরদিকে ইংরাজ জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর ইহাদের বল বিক্রম ও শৌর্য্য বীর্য্যের বিষয় চিন্তা কর। সমগ্র ইংলণ্ড দ্বীপটী ভারতবর্ষের তুলনায় কি সামান্য স্থান! বিস্তৃতিতে ইহার একটী প্রদেশের ন্যায়ও নহে অথচ এই সামান্য দ্বীপে যে জাতি বাস করিতেছে তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য কত? কেবল যে ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ইহাঁদের দ্বারা সুচারুরূপে চালিত হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাঁদের ভয়ে পৃথিবীর জাতি সকল সর্ব্বদা সশঙ্কিত। ইহাঁদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া জর্ম্মণির সম্রাট কার্য্য করিতে পারেন না; ইহাঁদিগের ভ্রুকুটী দেখিলে রুসিয়ার সম্রাটকে তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া কাঁপিতে হয়। ভারতবর্ষ কিরূপে শাসন হইতেছে তাহাই একবার চিন্তা কর। কিরূপ লোকের দ্বারা আমরা শাসিত হইতেছি? ইংলণ্ডের প্রথম

শ্রেণীর লোক গ্নাডষ্টোন, ব্রাইট প্রভৃতি ; তাঁহারা ত এদেশে আসিবার কথা স্বপ্নেও দেখেন না ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ফসেট প্রভৃতি ইহাঁদের দুই এক জন, গবর্ণর জেনারলের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন ; তৃতীয় শ্রেণীর লোকগণও এদেশে আসা প্রয়োজন মনে করেন না ; কেবল সেখানকার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়া ও অপরাপর কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এদেশে আগমন করেন। এই পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরাই এদেশকে ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন, রাজাগুলিকে কাদার পুতুলের ন্যায় সিংহাসনে তুলিতেছেন, নামাইতেছেন, সমুদায় রাজকার্য্য সুচারুরূপে চালাইতেছেন। ইহা কি আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়? ইহাতে কি ইংলণ্ডের বলের পরিচয় পাওয়া যায় না? সে দেশ না জানি কিরূপ হইবে যাহার পঞ্চম শ্রেণীর লোকদিগের এত শক্তি, এত বিক্রম। কিন্তু ইংরাজদিগের এই তেজস্বিতা ও মানসিক শক্তির মূল কোথায়? ইহার মূল তাঁহাদের রক্তে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে নির্ভীকতা, উদ্যোগিতা, কর্ম্ম কুশলতা, শ্রম দক্ষতা, অধ্যবসায়, স্বাধীনচিত্ততা প্রভৃতি গুণ গুলি অনেক পরিমাণে শারীরিক তেজের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমার একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা মনে হয়। একবার দেবগণ কোন অসুরের উপদ্রবে নিতান্ত উত্যক্ত হইলেন। দানব নিপাতের জন্য তাঁহারা অবশেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ;—

এইরূপ স্থির হইল যে দেবগণের অংশোদ্ধার করিয়া একজন অমিত-তেজ-সম্পন্ন রাজাকে সৃষ্টি করা হইবে। ইন্দ্র তিন ভাগ দিলেন, যম তিন ভাগ দিলেন, বায়ু বরুণ প্রভৃতি অপর দিক্‌পাল স্বীয় স্বীয় অংশোদ্ধার করিয়া দিলেন। এই সকল অংশে এক মহাশক্তির জন্ম হইল, তিনিই সেই দানব দলনে সমর্থ হইলেন। এরূপ আখ্যায়িকা আপনারা অনেকবার নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন। ইংরাজ জাতির জন্মও সেই প্রকারে। আদিতে স্যাক্‌সন, দিনেমার, নর্ম্মান, প্রভৃতি নানা জাতি সম্মিলিত হইয়া তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে এখনও বিবাহ সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহাদের কোন কুসংস্কার নাই। ইহাঁরা যেখানেই যাইতেছেন সেই-খানেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। ইংরাজ ফরাসিদেশে যাইতেছেন, একটী ফরাসি রমণী ঘরে আনিতেছেন, ইটালিতে যাইতেছেন ইটালীর রমণী ঘরে আনিতেছেন, এইরূপে নির-ন্তর নব নব রুধির-স্রোত ইংরাজ সমাজে প্রবাহিত হইতেছে। নানা শক্তির সমাবেশ হইয়া ইহাঁরা শক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদের ভাষা যেমন নানাভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাঁদের দেহ মনও তেমনি নানা জাতির গুণ শক্তি সকল লাভ করিয়া সবল হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ—এই জাতিভেদ প্রথা বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের উন্নতির পথে একটী কঠিন অর্গল স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। চীনদেশবাসীগণ যেমন এক পাষাণ প্রাচীরের

দ্বারা আপনাদের রাজ্যকে বেষ্টন করিয়া বাহিরের আলোক, বাহিরের উন্নতির স্রোত, বাহিরের চিন্তাকে বহু শতাব্দী ধরিয়া আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, হিন্দুগণও তেমনি জাতিভেদরূপ এক আধ্যাত্মিক প্রাচীরের দ্বারা আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সকল প্রকার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই জাপানবাসীগণ বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, বিগত দেড় শতাব্দীর অধিক ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়াও এদেশবাসীগণ সে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য্য এই ভারতের উপর দিয়া কত স্রোত বহিয়া যাইতেছে। এখানে মহাত্মা বুদ্ধের নব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এখানে মুসলমানগণ সশস্ত্র হইয়া আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এখানে শত শত খ্রীষ্টীয় প্রচারক দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া দেহের শোণিত শুষ্ক করিতেছেন, কিন্তু কেহই যেন এই স্থাবর, অচলিষ্ণু ঘনীভূত প্রাণিপুঞ্জকে অগ্রসর করিতেছেন না। ইহার কারণ কি? এই জাতিভেদ প্রথাই ইহার কারণ। জাতি-খড়্গ মস্তকোপরি দোদুল্যমান, কে হঠাৎ পা বাড়াইতে সাহসী হইবে। যদি এদেশবাসী নরনারীর গলদেশ জাতির নিগড়ে এত দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ না হইত, তাহা হইলে এদেশের রক্ষণশীলতা এত অধিক হইত না।

ষষ্ঠতঃ—জাতিভেদ যেমন এদেশবাসীদিগকে রক্ষণশীল ও উন্নতি পরাঙ্মুখ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে। আমাদিগকে কাপুরুষের জাতি করিয়াছে। এই কথাগুলি হৃদয়ের গুরুতর দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতেছি। মানবাত্মার উন্নতির সহায়তা করিবার জন্যই জনসমাজ। যে সমাজে বাস করিয়া আমি জ্ঞানে ধর্ম্মে বর্দ্ধিত হইব, প্রেম পবিত্রতা লাভ করিব, কর্ত্তব্যের পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারিব, স্বাধীন ভাবে অসং-কোচে ও নির্ব্বিঘ্নে আপনার সেই মনের শক্তি সকল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিব, তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত সমাজ। কিন্তু তাহা না হইয়া জনসমাজ যখন প্রপীড়ক ও অত্যাচারী হয়, যখন অবাধে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে দেয় না, যখন সরল ধর্ম্মপিপাসু লোকদিগকে দস্যু তস্করের ন্যায় সাজা দিতে আরম্ভ করে, যখন তন্মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিবেকের আদেশ পালন করা যায় না, নিজের আত্মার গৌরব ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারা যায় না. তখন সে বিকৃত সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত দেহের ন্যায়, মানবাত্মার বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন হিন্দু সমাজের সেই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। হায় হায়! ইহাতে আমাদের পুরুষদিগকে কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছে। জাতি যাওয়ার ভয়ে লোকে স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনেও পরাঙ্মুখ হইতেছে। ঐ দেখ একজন শিক্ষিত

গৃহস্থের নিরপরাধা বালিকা কন্যা দশমবর্ষে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সুকুমারমতি সরলস্বভাবা বালিকা সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ধূলা খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে পিতা দেশাচারের ভয়ে তাহাকে ধরিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক বৎসর না যাইতে যাইতে সে ঘোর বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন তাহার নবযৌবনের উদয়। শিক্ষিত পিতা ও অশিক্ষিতা জননী যতবার তাহার নবযৌবন প্রস্ফুটিত, সরল ও অনিন্দিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ততবার গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাহাদের হৃদয় বলিতেছে, প্রাণ বলিতেছে, ধর্ম্মজ্ঞান বলিতেছে যে, বল পূর্ব্বক তাহাকে চির বৈধব্য রাখা অকর্ত্তব্য—কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। কাহার ভয়? জাতি যাওয়ার ভয়। যদি জাতি বলিয়া একটা কিছু না থাকিত যদি দশজনে মিলিয়া একজনকে এত কষ্ট দিতে না পারিত তাহা হইলে কি ঐ বালিকার সাংসারিক সুখের পথে অর্গল পড়িত? বলিতে কি সমাজের ভয়ে লোকের মনুষ্যত্ব লোপ হইতেছে। যদি জাতিভেদ প্রথা না থাকিত সমাজের এত ভয় থাকিত না।

সপ্তমতঃ চিন্তা করিয়া দেখ এই জাতিভেদ প্রথা হইতেই বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতি নীতি এতদূর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানে হিন্দু সেইখানেই বাল্য বিবাহ প্রচলিত দেখা যায় কেন? জাতিভেদ প্রথা কি ইহার অন্যতম কারণ

নহে? বাঙ্গলা দেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন রাঢ়ী, বৈদিক ও বারেন্দ্র। ইহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। ইহাঁদের মধ্যে আবার কুলীন, মৌলিক, বংশজ আছে। ইহাদেরও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কঠিন নিয়ম। এইরূপে কালক্রমে বিবাহোপযোগী স্থল ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহার উপর এক বাটীতে এক পুরুষের বিবাহ হইলে, সে বাড়ীতে তাঁহার সন্তান সন্ততির বিবাহ হওয়ার স্থল অতি অল্প থাকে। ওদিকে আবার কন্যাদিগকে দশম বৎসরের পর অবিবাহিত রাখিতে ধর্ম্ম শাস্ত্রে কঠিন নিষেধ আছে, সুতরাং কালক্রমে যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কন্যাকর্ত্তাগণ উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই সময় না আসিতে বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কি জানি কন্যা বড় হইলে যদি উপযুক্ত পাত্র না পাই, তখন কন্যা রাখিতে পারিবনা সুতরাং উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিবেচনার সময় থাকিবে না, অতএব সময় থাকিতে একটী উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দুই হস্ত এক করিয়া দেওয়া যাউক। গৃহস্থগণ এইরূপ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই কারণে কলিকাতার দক্ষিণস্থ বৈদিকগণের মধ্যে সূতিকা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই জন্যই কুলীন ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে পারিবারিক সুখের কন্টক স্বরূপ বাল্য বিবাহ

প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই কারণেই এতদ্দেশীয় স্থবর্ণ বণিক, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই কন্যার বিবাহের ব্যয় ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। এই ব্যয় ইতি-মধ্যে এতদূর বাড়িয়াছে যে, কোন গৃহস্থের গৃহে তিনটী কন্যা জন্মিলে, সেই তিন কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। যাঁহাদের ঘরে উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত পুত্র আছে, তাঁহাদের লাভের সীমা নাই। তাঁহারা এক একটী পুত্রকে নীলামে বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এই সামাজিক দৌরাত্ম্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীসকলের মধ্যে এত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা করিতেছেন ও বলিতেছেন এস সকলে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক একটা ব্যয় ধার্য্য করি, তাহার অধিক কোন বরকর্ত্তা চাহিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না। হইবে কেন? যে জাতিভেদ প্রথা হইতে বাল্য বিবা-হের সৃষ্টি, যে জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন একটী ভাল ছেলের জন্য নীলামের ডাক পড়ে, সে প্রথা অপরিবর্ত্তিত থাকিতে উক্ত অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে না।

অষ্টমতঃ—জাতিভেদ প্রথাকে এজন্য ঘৃণা করি যে ইহা অধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জগদীশ্বর মানবকে দেহ মনের শক্তি দিয়া প্রত্যেককে এই অধিকার দিয়াছেন, আপনার ইচ্ছা মত সেই সমুদায় শক্তি নিজ উন্নতি সাধনে ও অপরের

কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করিবে। ইহাই ঐশ্বরিক বিধি। জাতিভেদ প্রথা এই বিধিকে লঙ্ঘন করিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা বলিতেছে তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, যদি জ্ঞানী হও, যদি ধার্ম্মিক প্রবর হও, কিন্তু তুমি যদি শূদ্র হও তবে তুমি ব্রাহ্মণের সমাধিকার পাইবে না। এই ন্যায়বিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ঈশ্বরেচ্ছা বিরুদ্ধ বিধি প্রচলিত থাকাতে বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে এইরূপে পদতলে চাপিয়া রাখাতে কি দেশের সমূহ অকল্যাণ করা হয় নাই? তাহারা যদি অবাধে আপনাদের শক্তি সকলকে বিকশিত করিবার অবসর পাইত, যদি স্বীয় শক্তি অনুসারে উন্নত পদে আরোহণ করিতে পারিত, যদি তদনুরূপ সামাজিক সম্ভ্রম লাভে সমর্থ হইত, যদি আপনাদের প্রতিভালোকে দেশীয় সাহিত্যকে আলোকিত করিতে পারিত, তাহা হইলে কি তাহাদের গৌরবে দেশ আরও গৌরবান্বিত হইত না? তাহাদের যশঃ সৌরভে ভারতাকাশকে আমোদিত করিত না? সে লাভ কাহার হইত? বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হওয়ার ফল আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? আমাদের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আমাদের কৃষ্ণদাস পাল, কে ইহাদের নাম স্মরণপূর্ব্বক স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করে না? জাতিভেদ প্রবল থাকিলে কি এ সকল লোককে পাওয়া যাইত? ইহাদিগের দ্বারা

দেশ কি উপকৃত হইতেছে না? চিন্তাবিহীন যুবক! তুমি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, এই দুরন্ত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকিলে আরও কত মহেন্দ্রলাল সরকার ও কৃষ্ণদাস পাল জন্মিতে পারিত। তবে দেখ জাতিভেদ প্রথা তোমার দেশের কি শত্রুতা করিয়াছে। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় ইংরাজগণ বলিয়াছিলেন—ভারতবীরগণ বিদ্যা বুদ্ধিতে যতই বড় হউক, আমাদের সমাধিকার পাইতে পারে না। তাহাতে কেন সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন? ইহাতে জাতিভেদের কথা. ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। পাপের উপর ইহার ভিত্তি।

নবমতঃ—আমি মনে করি জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধনই এ দেশবাসীদিগের পক্ষে পরের দাসত্ব পাশ গলে ধারণ করা সহজ হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির সংখ্যা দেশে সর্ব্বকালেই অধিক ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ কঠোর আধ্যাত্মিক দাসত্বের মধ্যে বাস করিয়া মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল সুতরাং যখন বিদেশীয়গণ এ দেশ আক্রমণ করিল, তখন মনুষ্যত্ববিহীন ও দাসত্বে অভ্যস্ত জাতি সকল অনায়াসে তাহাদের দাসত্ব নিগড় গলদেশে ধারণ করিতে সম্মত হইল।

আর অধিক দোষ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এই জাতিভেদ হইতে সমুহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদ প্রথা,. ভারতে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে, কায়িক শ্রমকে নিকৃষ্ট করিয়াছে, শিল্প বাণিজ্যের দুর্গতি করিয়াছে, দারিদ্র যাতনা বৃদ্ধি করিয়াছে,

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়াছে, সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে, হিন্দুগণের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া কাপুরুষতার বৃদ্ধি করিয়াছে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতি দূষিত রীতি সকল প্রসব করিয়াছে, জাতির উন্নতি ও মানসিক উন্নতির পথ রোধ করিয়াছে, শত শত বৎসর ধরিয়া নিম্নজাতীয়দিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে, এবং সর্ব্ব শেষে এ দেশবাসীদিগকে পরের দাসত্ব পাশ বহনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। আর কি শুনিতে চাও? এমন প্রথার সপক্ষে আবার কথা কও? আমি যখন এই সকল অনিষ্ট প্রথার বিষয় স্মরণ করি তখন বলি এই জাতিভেদ প্রথা যদি কোন ঝোপ বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হস্তে সজোরে ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিতাম। ইহা উন্নতির কণ্টক ও দেশের শত্রু।

---